১২.১৮ ন্যায়বিচার সম্পর্কে রলস্-এর ধারণা
John Rawls' concept of Justice

সমসাময়িককালের প্রখ্যাত রাষ্ট্রদার্শনিকের মধ্যে অন্যতম হলেন **জন রলস্** (John Rawls, 1921-2002), যিনি তাঁর *A Theory of Justice* (1971) গ্রন্থে ন্যায়বিচার সম্পর্কে মৌলিক বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। তাঁর অনুগামীদের দাবি, রলস্ এই গ্রন্থটির মাধ্যমে প্লেটো, কান্ট, মিল প্রমুখ প্রখ্যাত রাষ্ট্রদার্শনিকদের পাশে স্থান করে নিয়েছেন। রলসের মতে, যেসব গুণের ভিত্তিতে একটি সমাজ শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারে, তাদের মধ্যে ন্যায়বিচারই প্রধান ("Justice is the first virtue of a good society.")।

রলস্-এর মতে,স্বাধীনতা ও সুযোগ, আয় ও সম্পদ, আত্মমর্যাদা প্রভৃতি হল যে-কোনো সমাজের প্রাথমিক দ্রব্যসামগ্রী (Primary goods)। এই সমস্ত দ্রব্যসামগ্রীর ন্যায্য বন্টন ব্যবস্থাই হল ন্যায়। এগুলির অসম বণ্টনও ন্যায়নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে, যদি তার দ্বারা সমাজে সবচেয়ে কম সুবিধার (least privileged) মধ্যে থাকা মানুষদের উপকার হয়। প্রসঙ্গত, তিনি 'হিতবাদকে' ভীষণভাবে সমালোচনা করেছেন, কারণ, তাঁর মতে, 'সর্বাধিক মানুষের সর্বাধিক সুখ' পরিমাপের সময় এই তত্ত্ব ব্যক্তি বিশেষের সুখ-দুঃখকে আমল দেয় না। রলস্-এর মতে, যে কাজে সমাজের একজন লোককেও চরম দুর্দশা ভোগ করতে হয় সে কাজ ন্যায়সংগত হতে পারে না। অর্থাৎ কোনো কাজকে ন্যায়সম্মত হতে হলে সকলের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হতে হবে।

এখন প্রশ্ন হল, সমাজের প্রাথমিক দ্রব্যসামগ্রী কীভাবে বণ্টিত হলে সকলের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হবে। সমাজের প্রত্যেক মানুষই চায় অন্যের থেকে বেশি পেতে। স্বাভাবিকভাবেই বণ্টনকে কেন্দ্র করে মানুষে-মানুষে বিরোধ বাধতে পারে। আবার বণ্টিত প্রাথমিক বিষয়গুলির মধ্যেও বিরোধ বাধতে পারে। এটাই হল ন্যায়ের সমস্যা।

রলস্-এর মতে, এই সমস্যার সমাধান হতে পারে যদি সমাজের প্রাথমিক বিষয়গুলি বণ্টনের ক্ষেত্রে সমাজস্থ সকল ব্যক্তিকে নিয়ে একটা ঐকমত্যে পৌঁছানো যায়। রলস্ এক্ষেত্রে সামাজিক চুক্তি মতবাদের সাহায্য নিয়েছেন।

সামাজিক চুক্তি মতবাদটি নতুন কিছু নয়। তবে পূর্বে এই মতবাদটি ব্যবহার করা হয়েছিল রাজনৈতিক আনুগত্যের সমস্যা সমাধানে। আর রলস্ এটিকে ব্যবহার করেছেন ন্যায়ের সমস্যা সমাধানে।

চুক্তিবাদী লেখকদের মতো রলস্ও **আদি অবস্থান** (Original position)-এর কথা বলেছেন। তবে তিনি বিমূর্তকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গকে তাদের নির্দিষ্ট আর্থসামাজিক অবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিমূর্ত আদি অবস্থানে স্থাপন করেছেন। আদি অবস্থানে মানুষ স্বীয় স্বার্থবুদ্ধি ও যুক্তিবোধের দ্বারা পরিচালিত হলেও তারা একপ্রকার **'অজ্ঞানতার অবগুণ্ঠন'** (Veil of ignorance) এর মধ্যে থাকে। দেশ-কাল সম্পর্কে তাদের কোনো সচেতনতা থাকে না, নিজের নিজের সামর্থ্য, শক্তি ও বুদ্ধি সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা থাকে না। এই অবস্থানে প্রত্যেকেই নিজেকে অন্যের সমকক্ষ ভাবে। নিজের তথা অন্যের সম্পর্কে অজ্ঞানতাই আদি অবস্থানের মানুষদের মধ্যে একধরনের সাম্যাবস্থা সৃষ্টি করে। এই অজ্ঞতার অবগুণ্ঠনে থাকার জন্যই চুক্তিতে অংশগ্রহণকারী আদি অবস্থানের মানুষেরা সমাজের প্রাথমিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীকে যথাসম্ভব ন্যায্যভাবে বণ্টন করার নীতি গ্রহণ করবে এবং চুক্তিটি ন্যায্য (fair) হবে। এইভাবে রলস্-এর কাছে **ন্যায়নীতি হল ন্যায্যতা** ("Justice is fairness")। স্বার্থবুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও চুক্তিতে অংশগ্রহণকারী মানুষ কেন ব্যক্তিগত স্বার্থচিন্তার উর্ধ্বে উঠেছিল, সেটি বোঝানোর জন্য রলস্ একটি উপমার সাহায্য নিয়েছেন। জন্মদিন পালনের সময় যে ব্যক্তি কেক কাটছে সে যদি না জানে কেকের কোন্ টুকরোটি সে পাবে, তাহলে খুব সংগত কারণেই সে কেকটিকে যথাসম্ভব সমান ভাগে ভাগ করার চেষ্টা করবে। অনুরূপভাবে অজ্ঞানতার অবগুণ্ঠনে থাকার জন্য প্রত্যেকেই নিজেকে সবচাইতে কম সুবিধাজনক অবস্থানে (the least advantaged position) আছে বলে মনে করবে। এই কারণে প্রাথমিক বস্তুসামগ্রী বণ্টনের নীতি ঠিক করার সময় প্রত্যেকে সবচেয়ে কম সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে সবথেকে বেশি সুবিধা দেওয়ার দাবি জানাবে। এহেন পরিস্থিতিতে ন্যায়ের **তিনটি নীতি** সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে বলে রলস্ মনে করেন, যথা—

(*i*) **সমপরিমাণ স্বাধীনতার নীতি** (Principle of equal liberty) : এই নীতি অনুসারে মৌল স্বাধীনতা ভোগের ক্ষেত্রে প্রত্যেকের সমান অধিকার থাকবে। অর্থাৎ একজন লোকের স্বাধীনতাও যেন অন্যের অনুরূপ স্বাধীনতার কারণে ক্ষুণ্ণ না হয়। এই মৌল স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত হল বাক্স্বাধীনতা, শান্তিপূর্ণ সমাবেশ করার স্বাধীনতা, বিবেকের স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভোগ করার স্বাধীনতা, অবৈধভাবে গ্রেপ্তার না হওয়ার স্বাধীনতা, আইনের শাসনে বাস করার স্বাধীনতা ইত্যাদি।

(*ii*) **সুযোগসুবিধার ক্ষেত্রে ন্যায়সম্মত সমতার নীতি** (Principle of fair equality of opportunity) : এই নীতি অনুসারে সুযোগের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে কোনো পদ বা মর্যাদা লাভের ক্ষেত্রে সকলের সমান অধিকার থাকবে।

(*iii*) **প্রভেদ নীতি** (Difference principle) : এই নীতি অনুসারে প্রাথমিক বিষয়াদি বণ্টনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে কম সুবিধাপ্রাপ্তদের (least privileged) সর্বাধিক সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে। এই নীতিটিকে রলস্ ম্যাক্সিমিন (maximin) নীতি বলেছেন। এক্ষেত্রে সমতার নীতি থেকে বিচ্যুতিও ন্যায়সম্মত বলে বিবেচিত হতে পারে, যদি তা সমাজের ন্যূনতম সুবিধাপ্রাপ্ত লোকেদের সর্বাধিক মঙ্গলসাধন করতে পারে। অন্যভাবে বললে, কোনো ব্যক্তিকে তার বিশেষ যোগ্যতা ও উদ্যমের জন্য পুরস্কৃত করা সত্ত্বেও ন্যায়ের নীতি লঙ্ঘিত হবে না যদি তা ন্যূনতম সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সর্বাধিক মঙ্গলকে সুনিশ্চিত করে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, রলস-এর মতে প্রভেদ নীতির দুটি অংশ আছে— (ক) প্রাথমিক বিষয়াদির ক্ষেত্রে সবচেয়ে কম সুবিধাপ্রাপ্তদের সবচেয়ে বেশি সুবিধা দানের ব্যবস্থা করা এবং (খ) বিশেষ যোগ্যতা ও গুণের অধিকারী ব্যক্তিদের বিশেষ প্রতিদানের ব্যবস্থা করা। এই দুটি অংশকে তিনি একই সঙ্গে বহাল রাখার কথা বলেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি **শৃঙ্খল-সম্পর্ক** (Chain connection)-এর প্রসঙ্গটি উপস্থাপন করেছেন। কোনো একটি শৃঙ্খলকে মজবুত করতে হলে প্রথমে তার দুর্বল অংশটি চিহ্নিত করে সেটিকে মজবুত করে নিতে হয় এবং পরে এই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে শিকলটিকে মজবুত রাখতে হয়। অনুরূপভাবে একটি সমাজের মধ্যে ভালো অবস্থানে ও মন্দ অবস্থানে থাকা মানুষদের মধ্যে একটি শৃঙ্খল সম্পর্ক ক্রিয়াশীল থাকে। সমাজের ভালো অবস্থানে

থাকা মানুষদের প্রত্যাশা বৃদ্ধি ঘটলে মন্দ অবস্থায় থাকা লোকেদেরও প্রত্যাশা বৃদ্ধি ঘটে। কোনো বিশেষ সুযোগসুবিধা, ভরতুকি বা সংরক্ষণ অযৌক্তিক বা অন্যায্য হবে না যদি তা খারাপ অবস্থায় থাকা মানুষদের উপকারে আসে। এই প্রসঙ্গে ভারতে প্রচলিত সংরক্ষণমূলক বৈষম্য (Protective discrimination) নীতির উল্লেখ করা যেতে পারে। ভারতে প্রচলিত সংরক্ষণ নীতি অনুসারে ভারত সরকার তপশিলি জাতি ও উপজাতি, ইঙ্গ-ভারতীয় সহ অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি এবং মহিলা ও শিশুদের উন্নতির উদ্দেশ্যে সংবিধান অনুযায়ী বিশেষ সুযোগসুবিধার ব্যবস্থা করেছে। এরূপ বৈষম্যমূলক নীতির মূল উদ্দেশ্য হল সমাজের দুর্বল ও অনগ্রসর শ্রেণির মানুষদের অন্যদের সমকক্ষ করে তোলা। এইভাবে **জন রলস্** অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করে সাম্যের নীতিটিকে ন্যায়ের নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলার উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসেন।

মূল্যায়ন ঃ রলস্-এর ন্যায়বিচার তত্ত্ব রাষ্ট্রদর্শনের ক্ষেত্রে এক মূল্যবান সংযোজন ঠিকই, কিন্তু শুধুমাত্র বণ্টনব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে প্রচলিত সমাজব্যবস্থার স্থিতাবস্থা বজায় রেখে সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা কতখানি বাস্তব তা নিয়ে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেন। কেউ কেউ বলেছেন, রলস্ তাঁর ন্যায়বিচার তত্ত্বের মাধ্যমে ধনতন্ত্রের সপক্ষে নৈতিক সমর্থন গড়ে তুলতে চেয়েছেন। **সি. বি. ম্যাকফারসন** মনে করেন রলসীয় তত্ত্বে ব্যক্তিগত পুঁজিবাদী উদ্যোগকেই সমর্থন করা হয়েছে। তাঁর ন্যায়বিচার তত্ত্বে যে সমাজবাদের আভাস পাওয়া যায়, তার ভিত্তি হল মুক্তবাজার ভিত্তিক বণ্টনব্যবস্থা। সেখানে ধরে নেওয়া হয় যে, সমাজের ওপর তলার মানুষদের হাতে সঞ্চিত সম্পদ নীচু তলার মানুষরাও কিছু কিছু পাবে। কিন্তু বাস্তবে বিশ্বের কোনো দেশেই এই বণ্টনব্যবস্থার সাফল্য লক্ষ করা যায় না। তবে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, রলস্ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে যেসব আবশ্যিক শর্তের উল্লেখ করেছেন, সেগুলি পূরণ করা হলে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত মানবিক চরিত্রসম্পন্ন হয়ে উঠবে ("Once these conditions are fulfilled, the capitalist system is bound to assume a new human look."– O. P. Gauba.)।

১২.১৯ পদ্ধতিগত ন্যায়
Procedural Justice

পদ্ধতিগত ন্যায় অনেকটা সামাজিক ন্যায়ের মতো। পদ্ধতিগত ন্যায়ের প্রবক্তাদের মূল দাবি হল সামাজিক সুযোগসুবিধা বণ্টনের ক্ষেত্রে ন্যায়সংগত পদ্ধতি নির্ধারণ করা খুবই জরুরি। সামাজিক সুযোগসুবিধা বলতে দ্রব্য ও মেধা, সাহায্য ও সুযোগ, ক্ষমতা ও সম্মান ইত্যাদিকে বোঝায়। এই সকল সুযোগসুবিধা নির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে বণ্টন করাই হল ন্যায়।

পদ্ধতিগত ন্যায় উদারনীতিবাদের সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত। উদারনীতিবাদেও ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে ন্যায়সংগত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়। সুতরাং ন্যায়ের নীতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উপযুক্ত আইন অনুযায়ী নিরপেক্ষভাবে সুযোগসুবিধা বণ্টনকে বোঝায়। পদ্ধতিগত ন্যায়ের ক্ষেত্রে চুক্তির স্বাধীনতাকে খুবই গুরুত্ব দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠী অন্যকে গায়ের জোরে অথবা প্রবঞ্চনার মাধ্যমে দাবিয়ে রাখতে পারবে না। এটা অনেকটা ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মতো। এখানে কাউকে বিশেষ সুবিধা পাইয়ে দেওয়া হয় না, কেবল প্রতিযোগিতার নিয়মকানুনগুলোকে ঠিকমতো অনুসরণ করা হয়। প্রতিযোগিতার শেষে কে জিতল, কে হারল সেটা বিচার্য বিষয় নয়। **নরম্যান ব্যারি** (Norman Barry) তাঁর *An Introduction to Modern Political Theory* : 1989 গ্রন্থে সুন্দর উদাহরণ সহযোগে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি এক্ষেত্রে এমন একটি প্রতিযোগিতার কথা উল্লেখ করেছেন যেখানে যে জিতল সে ন্যায়নীতিসম্পন্ন কি না তা বিচার করা হয় না, বরং সে কার দ্বারা প্রতারিত হল কি না সেটা বিবেচনা করা হয়। এখানে দেখা হয় কেউ যেন ড্রাগ বা বিশেষ সুযোগ অবলম্বন করে না জিততে পারে। পদ্ধতিগত ন্যায় বাজার অর্থনীতিকে মনুষ্য আচরণের আদর্শ রূপ হিসেবে দেখে। এক্ষেত্রে দেখা হয় বাজারের নিয়ম মেনে দেশের সম্পদের যথার্থ বিকাশ। এই নিয়মের বাইরে গিয়ে যান্ত্রিক সামাজিক নীতি অনুসরণ করা হলে সম্পদের ক্ষতি হবে, সদ্ব্যবহার হবে না। পদ্ধতিগত ন্যায়ের প্রবক্তারা হলেন

হার্বার্ট স্পেনসার (1820–1903), এফ.এ.হায়েক (1899–1992), মিলটন ফ্রিডম্যান (1912–2006), রবার্ট নোজিক (1938–2002) প্রমুখ। এ ছাড়া জন রলস্-ও পদ্ধতিগত ন্যায়বিচার তত্ত্বের একজন বড়ো প্রবক্তা।

পদ্ধতিগত ন্যায়বিচার জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, বংশ, ভাষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি ভিত্তিতে মানুষে-মানুষে বৈষম্যকে অস্বীকার করে এবং প্রত্যেক মানুষের সম-মর্যাদা এবং নৈতিক মানে বিশ্বাস রাখে। এদিক থেকে দেখলে পদ্ধতিগত ন্যায়বিচার হল একটি প্রগতিশীল ধারণা। কিন্তু এই তত্ত্ব মানুষে-মানুষে প্রতিযোগিতাকে খোলা রাখে। এইভাবে **স্পেনসার** চেয়েছিলেন কোনো মানুষকে কোনো বিশেষ সুবিধা দেবে না, এমনকি যারা প্রতিবন্ধক, দুর্বল তাদেরও না। তিনি বলেছিলেন, দুর্বল মানুষেরা উচ্ছন্নে যাক। তাঁর যুক্তি হল, রাষ্ট্র যদি অক্ষমদের বা পাগল বা দুর্বলদের সাহায্য করে, তাহলে সক্ষম ব্যক্তিদের প্রতি অবিচার করা হবে এবং তাতে সামাজিক প্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হবে। স্পেন্সারের এই তত্ত্ব আবার **ডারউইনের** 'যোগ্যদের কেবল বাঁচার অধিকার' থাকবে (surival of the fittest) এই তত্ত্ব থেকে অনুসৃত। 'যোগ্যদের বাঁচার অধিকার' তত্ত্বকে মুছে ফেলার মানেই হবে পশু এবং মানুষের মধ্যে পার্থক্যকে মুছে ফেলা। **হায়েক** বলেছিলেন যে রাষ্ট্র সমাজের মধ্যে বিরাজমান প্রতিযোগিতাকে সর্বদা উৎসাহিত করবে এবং এইভাবে বাজার যেন বণ্টনমূলক ন্যায়বিচারের একটা যন্ত্রে পরিণত না হয় সেটা নিশ্চিত করবে। **ফ্রিডম্যান** (Friedman) প্রতিযোগিতামূলক পুঁজিবাদকে স্বাধীনতার অন্যতম শর্ত বলে মনে করেন। তিনি চেয়েছিলেন রাষ্ট্র সকল প্রকার কল্যাণমূলক এবং নিয়ন্ত্রণকারী কাজ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেবে। **নোজিক** (Nozick) বলেছিলেন, নাগরিকদের সম্পত্তিকে পুনর্বণ্টন করার কোনো অধিকার নেই রাষ্ট্রের।

সি.বি.ম্যাকফারসন (C.B.Macpherson) উপরোক্ত বক্তব্যগুলিকে খন্ডন করে সঠিকভাবেই বলেন, মুক্তবাজার অর্থনীতি জনগণের সৃষ্টিশীল স্বাধীনতাকে ধ্বংস করে ("...free market economy destroys the creative freedom of human beings.")। কারণ মুক্তবাজার অর্থনীতিতে জনসাধারণের প্রতিভা, নৈপুণ্য এবং কর্মক্ষমতার পূর্ণ বিকাশ ঘটাবার সুযোগ পায় না। এই অবস্থায় জনসাধারণের কাছে ন্যায়বিচার পৌঁছে দেওয়ার সুযোগ কোথায়?

বাস্তব ন্যায়বিচারও (Substantive justice) এইসব কারণে পদ্ধতিগত ন্যায়বিচারকে অস্বীকার করে। বাস্তব ন্যায়বিচার অনেকখানি সমাজতান্ত্রিক দর্শনের সঙ্গে খাপ খেয়ে যায়। এই তত্ত্বের প্রবক্তাদের মতে বাস্তব ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে দরিদ্র এবং সুযোগসুবিধাহীন (unprivileged) জনগণের ভাগ্য পরিবর্তনের অনেকখানি সুযোগ থাকে। সেই জন্য এই তত্ত্ব দাবি করে দরিদ্র ও সহায়সম্বলহীন জনগণের আত্মবিকাশের উপযোগী উপযুক্ত সুযোগসুবিধা থাকা বাঞ্ছনীয়।

১২.২০ বণ্টনমূলক ন্যায়
Distributive Justice

অ্যারিস্টট্‌ল রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বণ্টনমূলক ন্যায়কে ব্যাখ্যা করেছিলেন। বর্তমান দিনে ন্যায়ের এদিকটা আধুনিক সামাজিক চেতনার আলোকে বিচার করা হয়। বণ্টনমূলক ন্যায় প্রধানত অপরাধের শাস্তিবিধানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। **ডেভিড মিলার** শাস্তিজনিত ন্যায়ের ক্ষেত্রে তিনটি শর্তের কথা বলেছেন :

(ক) উপযুক্ত পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে কাউকে দোষী সাব্যস্ত করার পর তাকে শাস্তি দেওয়া উচিত;

(খ) শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে সমরূপতা বজায় রাখা দরকার, অর্থাৎ যেমন দোষ সেই অনুপাতে শাস্তিবিধান দরকার;

(গ) অপরাধের সঙ্গে সামাঞ্জস্য রেখে শাস্তির পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে, অর্থাৎ শাস্তিবিধান কখনোই অতি কঠোর বা অতি লঘু ধরনের হবে না।

সংক্ষেপে, অপরাধের মাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এবং অপরাধ যথাযথভাবে প্রমাণিত হলেই কাউকে শাস্তি দেওয়া যাবে। অপরদিকে বণ্টনমূলক ন্যায় কতকগুলি নিশ্চিত প্রমাণের ভিত্তিতে হবে, কাউকে সুবিধা পাইয়ে দিয়ে এবং কারও ওপর বোঝা চাপিয়ে শাস্তির পরিমাণ নির্ধারিত হবে না।

ডেভিড মিলার (David Miller) তাঁর *Social Justice* নামক বিখ্যাত গ্রন্থে বণ্টনমূলক ন্যায়ের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেন, সামাজিক ন্যায় হল এমন নীতি নির্ধারণ যা সমাজের সদস্যদের মধ্যে সম্পদ, মর্যাদা এবং অন্যান্য সুযোগসুবিধা বণ্টনের ব্যবস্থা করবে ("...the principle which should be chosen to govern the distribution of wealth, prestige and other benefits among the numbers of society.")। তিনি বণ্টনমূলক ন্যায়ের নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে তিনটি নীতির কথা বলেছেন :

(*i*) স্বীকৃত অধিকার সংরক্ষণ করা (Protection of acknowledge rights);

(*ii*) পুরস্কার বা শাস্তি পাওয়ার নীতি অনুযায়ী বণ্টন (Distribution according to desert)

(*iii*) প্রয়োজন অনুযায়ী বণ্টন (Distribution according to need)।

এই শর্তগুলির প্রত্যেকটির সুবিধা ও অসুবিধা দুইই আছে; এগুলির কোনোটিকেই চূড়ান্ত নীতি হিসাবে গ্রহণ করা যায় না।

এখন দেখা যাক কোন্‌টার কী দোষ বা গুণ। **প্রথম তত্ত্বটি** অর্থাৎ 'স্বীকৃত অধিকার সংরক্ষণ' একটি ক্রমোচ্চ স্তর (hierachical order) ঠিক করে দেয়। এই ব্যবস্থায় জনগণকে তাদের গুরুত্ব অনুযায়ী বিভিন্ন অবস্থানে দাঁড় করিয়ে দেয়। বর্তমান অধিকার এবং অবস্থানকে সংরক্ষণ করার অর্থই হল গরিব ও সহায়সম্বলহীন মানুষদের দাবিকে অস্বীকার করা। উদাহরণস্বরূপ, অ্যারিস্টট্‌লের ক্রীতদাস প্রথা সমর্থনের পিছনে যুক্তি ছিল ক্রীতদাসরা অন্য মানুষদের মতো গুণের অধিকারী নয়। একটি ক্রীতদাস শুধু তার প্রভুকে সেবা করার মধ্যে দিয়ে কিছু সুযোগসুবিধা পেতে পারে। অনুরূপভাবে ভারতের জাত ব্যবস্থাকে সমর্থন করা হয় এই বলে যে, যারা নীচু জাতের মানুষ তারা উঁচু জাতের মানুষদের সেবা করবে, এটাই বিধান বা ন্যায়সংগত। সুতরাং আমরা যদি 'স্বীকৃত অধিকার সংরক্ষণের' দাবিকে আঁকড়ে ধরে থাকি তাহলে সামাজিক ন্যায়ে কখনোই পৌঁছানো যাবে না।

দ্বিতীয় তত্ত্বটি অর্থাৎ পুরস্কার বা শাস্তি পাওয়ার নীতি অনুযায়ী বণ্টন 'বাজার সমাজ' (market society) ব্যবস্থাকে সমর্থন করে। এটা যদিও জন্ম-নীতি অনুযায়ী সুযোগসুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনাকে অস্বীকার করে, তবুও এটা সমাজের মধ্যে এক ধরনের উচ্চ-নীচ স্তরভেদ সৃষ্টি করে, এখানে সামাজিক সুবিধা (social benefit) পাওয়ার নীতি নির্ধারিত হয় সামাজিক কল্যাণে একটা মানুষের অবদানের উপর ভিত্তি করে। এ ছাড়া এই নীতি বাজারের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সেই কারণে সমাজে গরিব ও বড়ো লোকের মধ্যে ব্যবধান বেড়ে যায়। **হার্বার্ট স্পেনসার** (Herbert Spencer) যিনি এই নীতির সবচেয়ে বড়ো সমর্থক, সামাজিক জীবনে যোগ্য লোকেরাই কেবল টিকে থাকবে (survival of the fittest) নীতিকে প্রয়োগ করার পক্ষপাতি ছিলেন। তিনি অযোগ্য, দুর্বল এবং বুদ্ধিহীন লোকদের কোনোরকম সাহায্য দেওয়ার বিরোধী ছিলেন।

তৃতীয় নীতিটি—'প্রয়োজন অনুযায়ী বণ্টন' নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়, কিন্তু এটার কিছু সমস্যা আছে। এই নীতিটির যথার্থ প্রয়োগ ঘটলে সামাজিক সংহতি বাড়বে ঠিকই, কিন্তু এই নীতিটির প্রয়োগ তখনই সম্ভব হবে যখন দ্রব্য এবং সেবা অপরিযাপ্ত হবে। সেটা কখনোই সম্ভব নয়, এবং সেই কারণে এই নীতিটি কাল্পনিক ছাড়া কিছুই নয়। যখন প্রয়োজনীয় জিনিসের অভাব থাকবে, এবং সেটাই সর্বদাই থাকে, তখন এই নীতি প্রয়োগ করতে চাইলে যারা প্রতিভাবান এবং পরিশ্রমী তাদের কাজে আগ্রহ এবং উৎসাহকে হত্যা করা হবে। এরকম চলতে থাকলে সমাজ ক্রমশই অবনতির দিকে যাবে এবং এই নীতির প্রয়োগ অসম্ভব হয়ে উঠবে।

এই সমস্যা থেকে মুক্তির উপায় হল দ্বিতীয় এবং তৃতীয় নীতিদুটির যৌথ প্রয়োগ। প্রথমত, জনগণকে তাদের প্রয়োজনের মাত্রা কমাতে হবে এবং সমাজের মোট উৎপাদন যথার্থভাবে বণ্টন করতে হবে। এই রকমই বক্তব্য ছিল ভারতের সামাজিক দার্শনিক মহাত্মা গান্ধীর (১৮৬৯-১৯৪৮)। রাষ্ট্র শুধু জনগণের প্রাথমিক ন্যূনতম চাহিদাটুকু মেটাবে তাদের বেঁচে থাকা এবং বুনিয়াদি শিক্ষার জন্য। এরপর সমাজে তাদের অবদান অনুযায়ী দ্রব্যাদি বণ্টনের নীতি নির্ধারিত হবে।